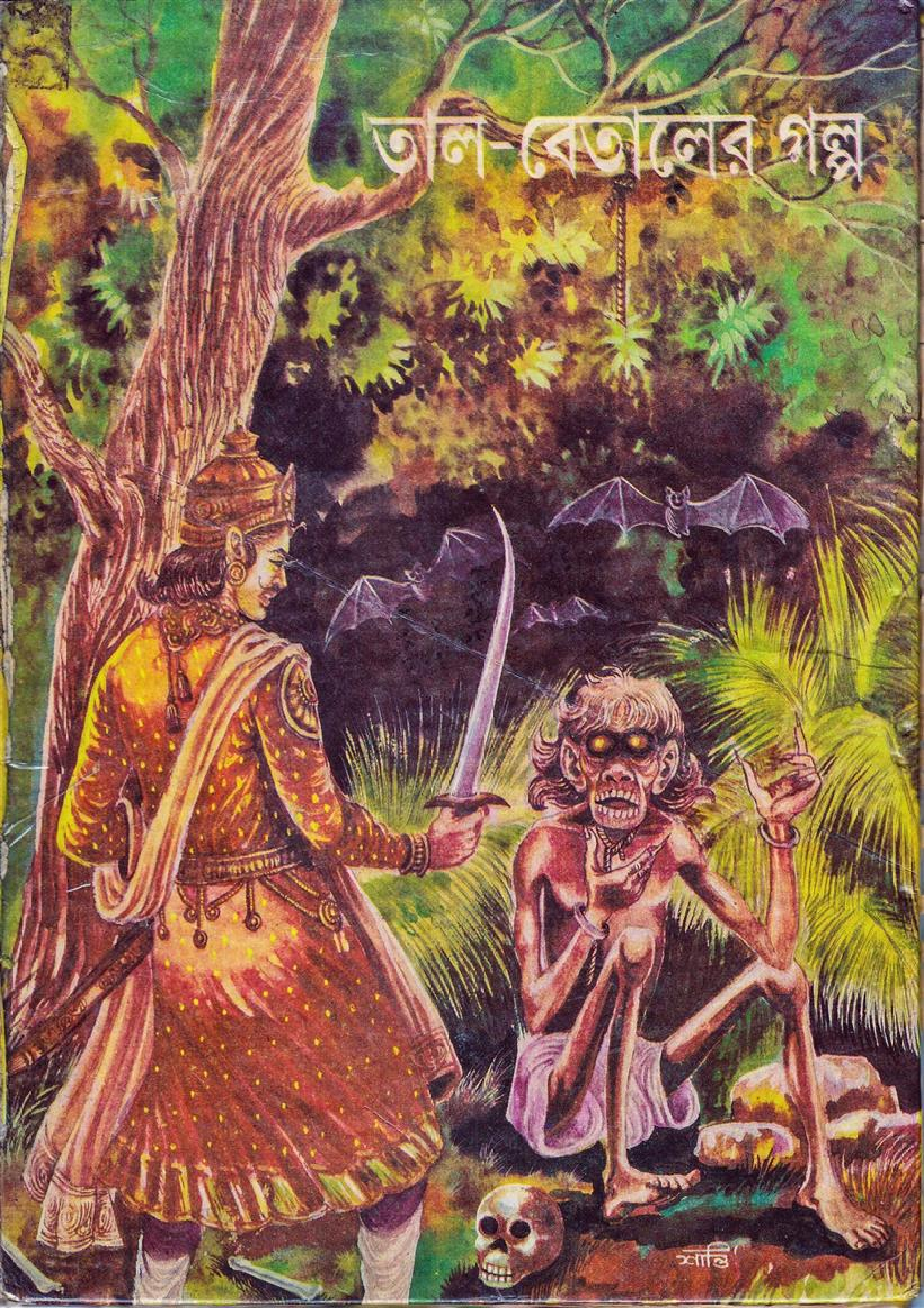
তাল-বেতালের গল্প
শান্তি

Wasee Ahmed

সম্পাদনায় ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ
নির্মলকুমার সাহা
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক ঃ
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভেতরের ছবি ঃ শান্তি

প্রচ্ছদ ছবি ঃ গৌতম বসু

মুল্য ঃ দশ টাকা

ভোজনবিলাসী ও শয়নবিলাসী

ধর্মপুর নগরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে। তাদের একজন ভোজনবিলাসী আর একজন শয়নবিলাসী। ভোজনবিলাসী বাড়িতে খেতে বসে অধিকাংশ দিনই খায় না, অশান্তি করে। কারণ সে তার মায়ের দেওয়া ভাত বা তরকারির মধ্যে কোন না কোন খুঁত বার করে।

ব্রাহ্মণের শয়নবিলাসী ছেলেটিকে নিয়েও ঝামেলা বড় কম নয়। তাকে যেমন নরম বিছানাতেই শুতে দেওয়া হোক না কেন, বিছানার নীচে অতি সামান্য কিছু থাকলেও সে শুতে পারে না।

ব্রাহ্মণের এই দুই ছেলের দুই ধরনের বিলাসের খবর সেই দেশের রাজার কানে পৌঁছালো। রাজা তাদের দুই ভাইকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তারা হাজির হলে রাজা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে কোন বিলাসী তা বল।' প্রথমজন বললো, 'মহারাজ, আমি খাবারের মধ্যে অতি সামান্য গন্ধও টের পাই। আর তা রুচিকর না হলে আমি সে খাবার খাই না।' দ্বিতীয় জন বললো, 'আমি আমার বিছানার নীচে সামান্য কিছু থাকলেও টের পাই। আমি সে বিছানায় শুতে পারি না।'

রাজা পরীক্ষা করবার জন্য নানারকম স্বাদু তরকারি এবং পরমান্ন তৈরী ক'রে ভোজনবিলাসীর খাওয়ার আয়োজন করালেন। কিন্তু ভোজনবিলাসী খেতে বসেই আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। বললো, 'মহারাজ ভাতে মড়া পোড়ার ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। আমি ওভাত খেতে পারব না।' রাজা তখনই সেই ভাতের চাল কোন জমির ধান থেকে তৈরী হয়েছে তা জানতে চাইলেন। রাজার ভান্ডারী খবর নিয়ে রাজাকে জানালেন যে, সত্যই সেই ধানের জমিটি একটি শ্মশানের পাশে, রাজা যারপরনাই খুশী হয়ে ভোজন বিলাসীকে নানা উপহার দিলেন।

এরপর শয়নবিলাসীর পরীক্ষা। রাজার আদেশে পর পর পনেরোখানি গদি পেতে শয়নবিলাসীর বিছানা করা হয়েছিল। শয়নবিলাসী তাতে শোবা মাত্রই উঠে পড়ে বললো, 'মহারাজ উপর থেকে দশখানা গদির নীচে একগাছি চুল আছে। ওই চুল আমার পিঠে ঠেকছে। কাজেই ওই বিছানায় আমার শোয়া সম্ভব নয়।' দেখা গেল, সত্য সত্যই দশটি গদীর নীচে একগাছি চুল।

রাজা খুশী হয়ে শয়নবিলাসীকেও প্রচুর উপহার দিলেন। এই উপহার

পেয়ে ব্রাহ্মণ গোবিন্দের দুঃখের দিন শেষ হলো। তখন বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজা বল দেখি, এই দুই বিলাসীর মধ্যে কে বেশী যোগ্য?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শয্যাবিলাসী, কারণ নাকে গন্ধ পাওয়ার থেকে চামড়ায় চুলের মত মিহি জিনিস অনুভব করা বড় কঠিন।'

মরা বাঘের বেঁচে ওঠা

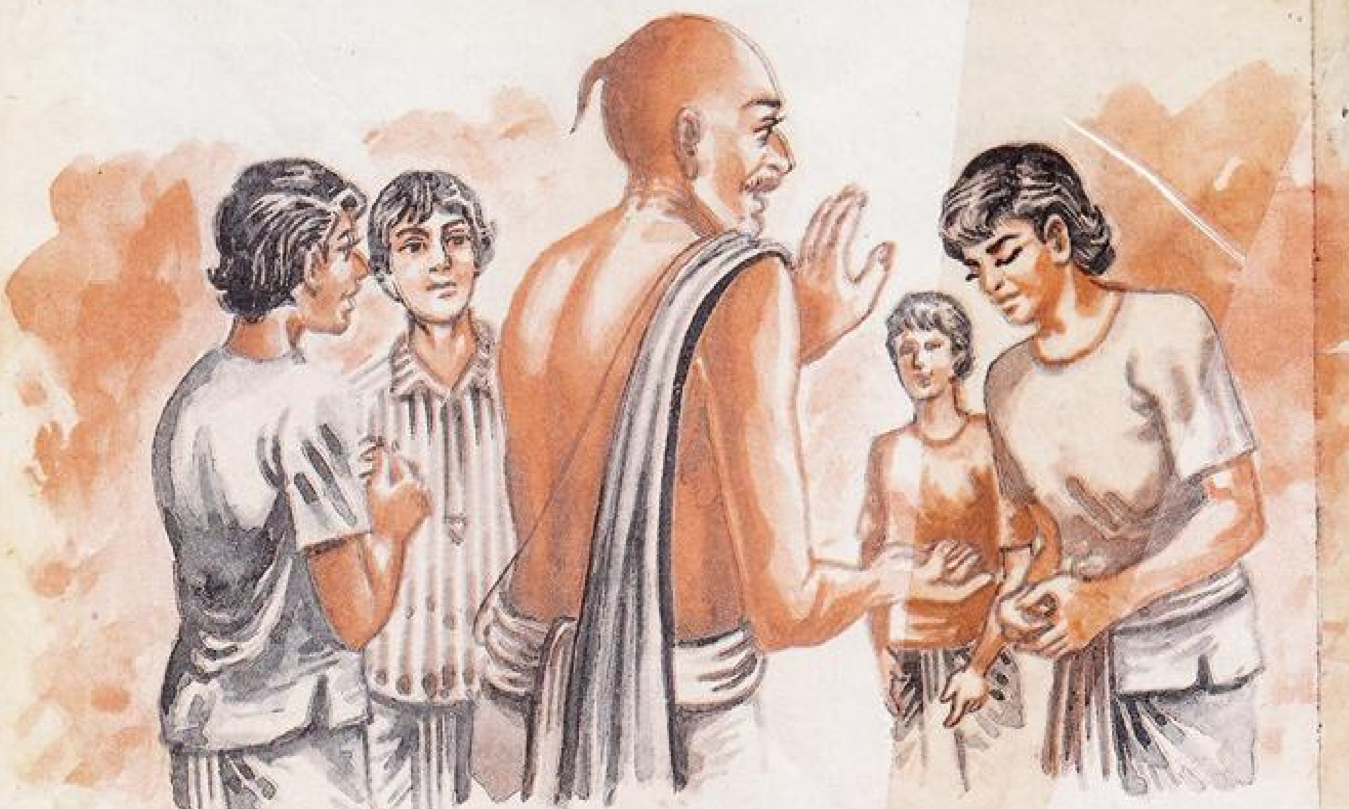

এক ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর চারটি ছেলে। কোনটাই ব্রাহ্মণের ছেলে হিসাবে পরিচয় দেবার মত নয়। চার ভাইয়ের একজন সারাদিন পাশা খেলে দিন কাটায়। দ্বিতীয় জন অলস। কোন রকম কাজকর্ম না করে সারাদিন বসে-ঘুমিয়ে কাটায়। তৃতীয় জন চোর। সুযোগ পেলেই এর-ওর-তার বাড়ি চুরি করে। আর চতুর্থ জন ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে না। নানা অনাচার করে দিন কাটায়।

ব্রাহ্মণ তাদের নানা উপদেশ দেন। যে ছেলের পাশার নেশা, তাকে বলেন, 'পাশার মত সর্বনাশা নেশা আর নাই। যে পাশা খেলে, তার ঘরে লক্ষ্মী আসে না।' পাশা খেলার ফলে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কি দুর্গতি হয়েছিল তাও শোনান। কিন্তু কাজ হয় না।

যে ছেলে অলস, তাকে বলেন, 'অলস কোনদিন জীবনে উন্নতি করতে পারে না। যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে।' কিন্তু কোন কাজ হয় না। তার অলসতা বেড়েই চলে।

ব্রাহ্মণের যে ছেলেটি চোর, তাকেও তিনি নানা উপদেশ দেন। বোঝান, 'চুরির তুল্য পাপ নেই। চোরকে কেউ বিশ্বাস করেনা।' তাতে তার চুরি থামে না। বরং বেড়েই চলে।

যে ছেলেটি ঠাকুর-দেবতা মানে না, তাকে ব্রাহ্মণ বলেন, 'তোর মত কুলাঙ্গারের মুখ দেখলেও পাপ। ভালো চাস তো ভগবানে বিশ্বাস রাখ্।'

অবশেষে ব্রাহ্মণের চার ছেলের কোনরকম পরিবর্তন এলো না। ব্রাহ্মণ একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তোদের মত অপদার্থ ছেলেদের মরণ কামনা করি।'

একথা শুনে ব্রাহ্মণের চার ছেলের মনে ধিক্কার জন্মালো। তারা বেরিয়ে পড়লো বিদেশে। ঠিক করলো, যেমন করেই হোক যে কোন ভালো বিদ্যা শিখতে হবে। তাদের ইচ্ছা পূরণ হলো। চার ভাইয়ে চার রকম বিদ্যা শিখে দেশের পথে পা বাড়ালো।

তারা পথে আসতে আসতে দেখে, এক বনের পাশে এক চামার একটা মরা বাঘের চামড়া আর মাংস নিয়ে চলে গেল। কেবলমাত্র হাড়গুলো পড়ে রইলো। ব্রাহ্মণপুত্রদের একজন তার শেখা বিদ্যায় বাঘের হাড়গুলো এক জায়গায় করে বাঘের একটা কংকাল সাজিয়ে ফেললো।

দ্বিতীয় জন তার বিদ্যার সাহায্যে বাঘের কংকালে মাংস এনে ফেললো। তৃতীয় জন তার শেখা বিদ্যা কাজে লাগিয়ে বাঘের মাংসলাগা কংকাল চামড়া দিয়ে ঢেকে ফেললো। বাকি থাকলো শুধু প্রাণটুকু আনা।

চতুর্থ জন তার শেখা বিদ্যা কাজে লাগিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনলো। সে শিখেছিল মৃতদেহে প্রাণ আনার বিদ্যা। সেই বিদ্যা কাজে লাগাতেই বাঘটি জীবন্ত হয়ে উঠলো আর চার ব্রাহ্মণপুত্রকে সে মেরে ফেললো।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা, বলো দেখি, এই চারজন ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে কে সব থেকে বোকা।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'চতুর্থ জন। কারণ সে বাঘের প্রাণ না দিলে বাঘের মুখে তাদের প্রাণ যেতো না।'

চোরের হাসি-কান্না

একবার রাজা রণধীরের রাজ্যে চোরের উপদ্রব বেড়ে গেল। প্রজারা রাজার কাছে এসে বললো, 'মহারাজ, চুরি বন্ধ না করলে আমাদের বাস করা দায় হয়ে উঠছে। অনুগ্রহ করে ব্যবস্হা করুন।' রাজা অনেক প্রহরীদের চোর ধরার কাজে লাগালেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। চোরেদের উপদ্রব বেড়েই চললো।

অবশেষে রাজা নিজে বেরিয়ে পড়লেন চোর ধরার কাজে। এক রাতে রাজা একজন লোককে রাজপথে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?' লোকটা বললো, আমি চোর। 'তুমি কে, তা বলো দেখি?' রাজা বললেন, 'আমিও চোর।' চোর বললো, 'তা হলে চলো, দু'জনে মিলে চুরি করি।'

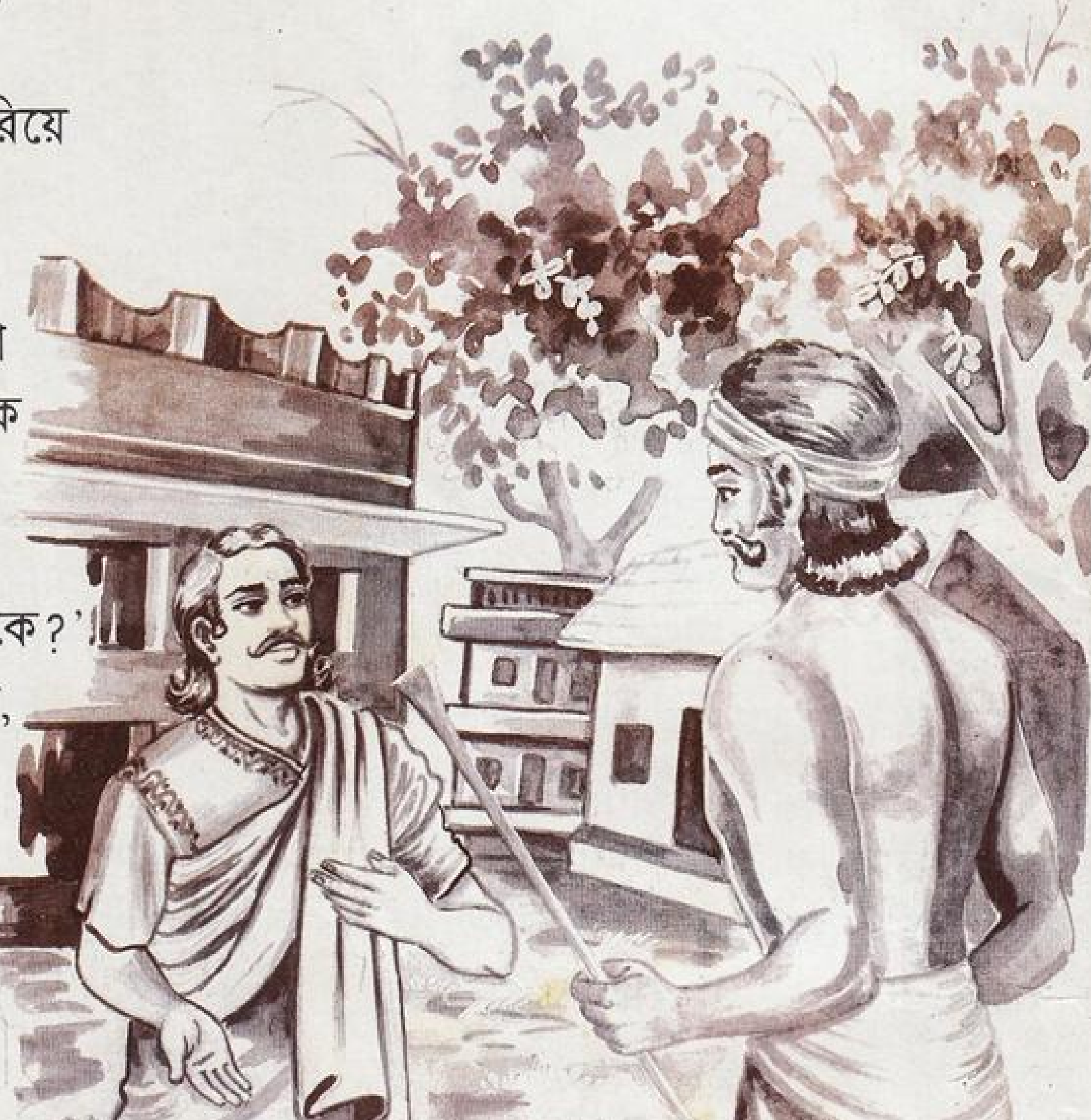

এক ধনী বণিকের বাড়ি থেকে চোরের সঙ্গে রাজাও সে রাতে অনেক টাকা পয়সা চুরি করলেন। তারপর সেই চোরের সঙ্গে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে

পাতালপুরীতে পৌঁছালেন। চোর রাজাকে দরজার সামনে বসিয়ে রেখে পাতাল-পথে নেমে গেল। রাজাকে সেখানে দেখতে পেয়ে চোরের এক দাসী বললো, 'বাবা, তুমি এখান থেকে পালাও। না হলে ওই চোর এবার ফিরে এসে তোমাকে মেরে ফেলবে।'

রাজা রণধীর রাজধানীতে পালিয়ে এসে পরদিনই চোরের পাতালপুরী সৈন্য-সামন্ত দিয়ে ঘিরে ফেললেন। চোরের ওই পাতালপুরী রক্ষা করতো এক রাক্ষস। সে চোরকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে রাজার সৈন্য-হাতী-ঘোড়া টপাটপ্ গিলে ফেলতে লাগলো। যারা পালালো, তারাই বাঁচলো। রাজাও পালাচ্ছেন দেখে চোর তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। বললো, 'তুমি রাজা হয়ে যুদ্ধ না করে পালিয়ে যেতে লজ্জা পাচ্ছো না? তোমার জীবনে ধিক!'

তখন রাজা চোরের সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাজিত করলেন। তারপর তাকে রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে, তাঁর লোকদের বললেন, 'একে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাজপথে ঘোরাও। তারপর সকলের সামনে ওকে শূলে চড়াও।'

রাজার লোকেরা তা-ই করলো। কারণ তার উপর সারা রাজ্যের লোকের রাগ। সে তাদের সর্বস্ব লুঠে নিয়ে অনেককে গরীব করে ছেড়েছে। ব্যাপার দেখে এক বণিকের মেয়ের চোরের উপর মায়া হলো। সে তার বাবাকে বললো, 'বাবা, তুমি তোমার সব কিছুর বিনিময়ে ওই চোরের জীবন বাঁচাও। না হলে আমি আত্মঘাতী হবো।'

বণিক রাজাকে তার সবকিছুর বিনিময়ে চোরের প্রাণভিক্ষা চাইলো। রাজা রাজী হলেন না। চোরকে শূলে দেবার সব আয়োজন শেষ হলো, ততক্ষণে চোরের কানেও এ খবর গিয়ে পৌঁছেছে যে, এক বণিকের মেয়ে তাকে বাঁচাতে চাইছে। শূলে চড়ার আগে চোর একবার হাসলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে শূলে চড়ে প্রাণত্যাগ করলো।

বেতাল বিক্রমাদিত্যের কাছে চোরের এই হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাজা বললেন, 'চোর ভাবলো, বণিককন্যার তার উপর দয়া যদি বা হলো, তা-ও হলো তার মরণ সময়ে! এই ভেবে সে হাসলো। আর সে বাঁচলে বণিককন্যার সে কোন উপকারেই বা আসতো! এই ভেবে চোর কাঁদলো।'

এক মেয়ে, তিন বর

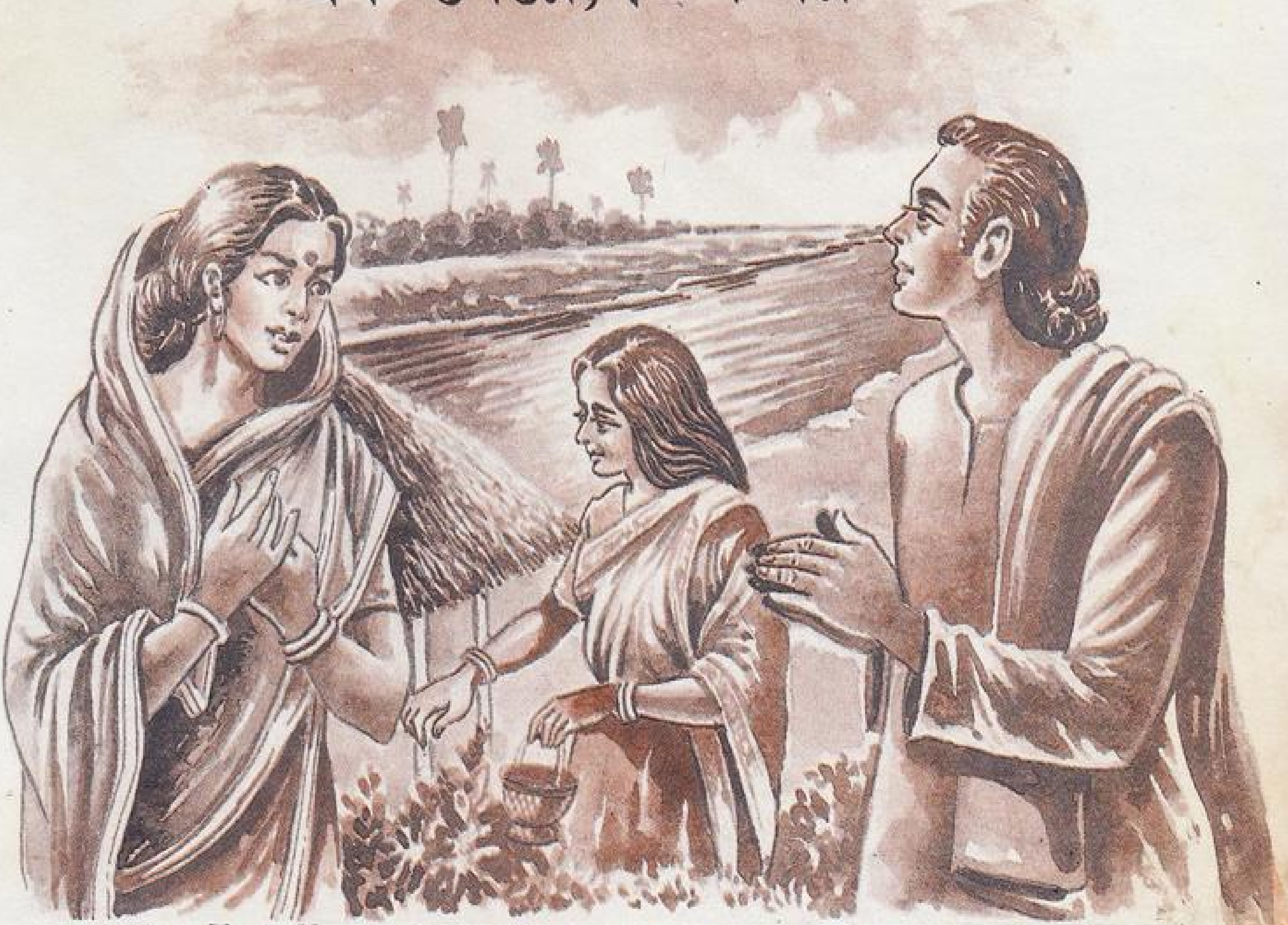

যমুনা নদীর তীরে এক নগরে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণী। তাঁদের এক ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়ে মধুমালতী ছিল খুব সুন্দরী। পুজো-পার্বণের কাজে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণপুত্র তখন বেশ কিছুদিনের জন্যে বাড়িতে ছিলেন না। একদিন ত্রিবিক্রম নামে এক সুন্দর এবং গুণী ব্রাহ্মণকুমার এসে হাজির হলো। ব্রাহ্মণী তাকে তাঁদের বাড়িতে পরম সমাদরে রেখে দিলেন। ব্রাহ্মণযুবকের রূপে-গুণে খুশী হয়ে ব্রাহ্মণী তার সঙ্গে মধুমালতীর বিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্রাহ্মণযুবকও গররাজী হলো না।

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণপুত্র বাড়ি ফিরলেন। তাঁরাও তাঁদের সঙ্গে এনেছেন দু'জন পাত্র। দু'জনেই রূপবান এবং গুণবান। তাদের একজনের নাম বামন এবং আর একজনের নাম মধুসূদন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর ব্রাহ্মণপুত্র বড়-বিপদে পড়লেন। তিন জনেই তিন পাত্রকে মধুমালতীর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে কথা দিয়ে ফেলেছেন।

ঠিক এই সময়ে খবর পাওয়া গেল, মধুমালতীকে সর্প দংশন করেছে। দেরী না করে চার-পাঁচজন ওঝাকে এনে বিষ নামানোর চেষ্টা করা হলো। ফল হলো না। মধুমালতী মারা গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর ব্রাহ্মণপুত্রই নন, তিন-পাত্র, ত্রিবিক্রম, বামন এবং মধুসূদনও মর্মাহত হলো। মধুমালতীর দাহ কাজ শেষ হলে ত্রিবিক্রম চিতা থেকে মধুমালতীর অস্হি নিয়ে দেশে দেশে মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বামন সন্ন্যাসী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে থাকলো। আর মধুসূদন শ্মশানের পাশে কুটীর বানিয়ে মধুমালতীর চিতার ছাই এক পাশে রেখে সাধনা করতে শুরু করলো।

একদিন সন্ন্যাসী বামন এক ব্রাহ্মণের অতিথি হলো। ব্রাহ্মণের পাঁচ বছর বয়সের একটি ছেলে বড় দুরন্ত। সে দারুণ বিরক্ত করায় ব্রাহ্মণী তাকে এক জ্বলন্ত উনানে ঢুকিয়ে দিলেন। তা দেখে বামন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে রাক্ষস ভেবে চলে যেতে উদ্যত হলো। ব্রাহ্মণ তা বুঝতে পেরে ঘর থেকে একটি পুঁথি এনে মন্ত্র পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ব্রাহ্মণ শিশু উনান থেকে বার হয়ে এসে আবার দুরন্তপনা শুরু করলো। বামন তা দেখে অবাক হয়ে গেল। আর ভাবলো, যেমন করে হোক ওই পুঁথিটি পেতে পারলে মধুমালতীকেও বাঁচিয়ে তোলা যায়।

বামন সেদিন রাত্রেই সেই পুঁথিখানি চুরি করে নিয়ে সটান হাজির হলো শ্মশানে। যেখানে মধুসূদন মধুমালতীর চিতার ছাই সামনে রেখে সাধনায় রত। এমন সময় ত্রিবিক্রমও সেখানে ফিরে এলো।

বামন বললো, 'দেরী না করে তোমরা দু'জন মধুমালতীর দেহের ছাই আর অস্থি এক জায়গায় আনো। আমি তাকে বাঁচিয়ে তুলবো।' দেখা গেল, মন্ত্রবলে মধুমালতীর দেহ আবার প্রাণ ফিরে পেলো। কিন্তু বিবাদ বাধলো তিন পাত্রের মধ্যে। তিন জনেই মধুমালতীকে বিয়ে করতে চায়।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো তো, এই তিনজনের মধ্যে মধুমালতীকে বিয়ে করার অধিকার কার? বিক্রমাদিত্য বললেন, 'মধুসূদনের। কারণ যে প্রাণ দান করে, সে পিতার তুল্য। যে অস্থি গ্রহণ করে, সে পুত্রতুল্য। কাজেই মধুসূদন মধুমালতীকে বিয়ে করার অধিকারী।'

বীরবরের গল্প

বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক রাজা ছিলেন। একদিন বীরবর নামে এক ভিনদেশী রাজকুমার দরবারে রাজার কাছে এসে বললো, 'মহারাজ আমি আপনার অধীনে কাজ করতে চাই। যে কোন কঠিন কাজ আমি করতে পারি। তবে আমাকে আমার কাজের বিনিময়ে প্রতিদিন এক হাজার সোনার টাকা গুণে দিতে হবে। আমার সংসারে আমার স্ত্রী, এক পুত্র আর এক কন্যা আছে।'

রাজা ভাবলেন, বীরবরের সংসারে এত কম লোক, তবু এত টাকা কিসের প্রয়োজন? যাই হোক রাজা বীরবরকে কাজে নিযুক্ত করলেন। এবং প্রথমদিনের বেতন হিসাবে এক হাজার সোনার টাকা মিটিয়ে দিলেন। রাজা গুপ্তচরের কাছে জানতে পারলেন যে, বীরবর সেই টাকার এক ভাগ দেব-সেবায় লাগায়, এক ভাগ ব্রাহ্মণ ও দুঃখীজনদের দান করে; আর এক ভাগ দিয়ে সে তার সংসার চালায়। রাজা এই খবর পেয়ে খুশী হলেন।

একদিন রাত্রে দূরে এক নারীর কান্নার শব্দ শুনে রাজা বীরবরকে বললেন, 'বীরবর কে, কোথায় এবং কেন কাঁদছে, সঠিক সংবাদ নিয়ে এসো।' কান্নার শব্দ অনুসরণ ক'রে বীরবর এক শ্মশানে হাজির হয়ে দেখে, এক রমণী কাঁদছেন। বীরবর তাঁকে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, 'আমি রাজলক্ষ্মী কিন্তু রাজা রূপসেনের রাজ্য বিশেষ কারণে

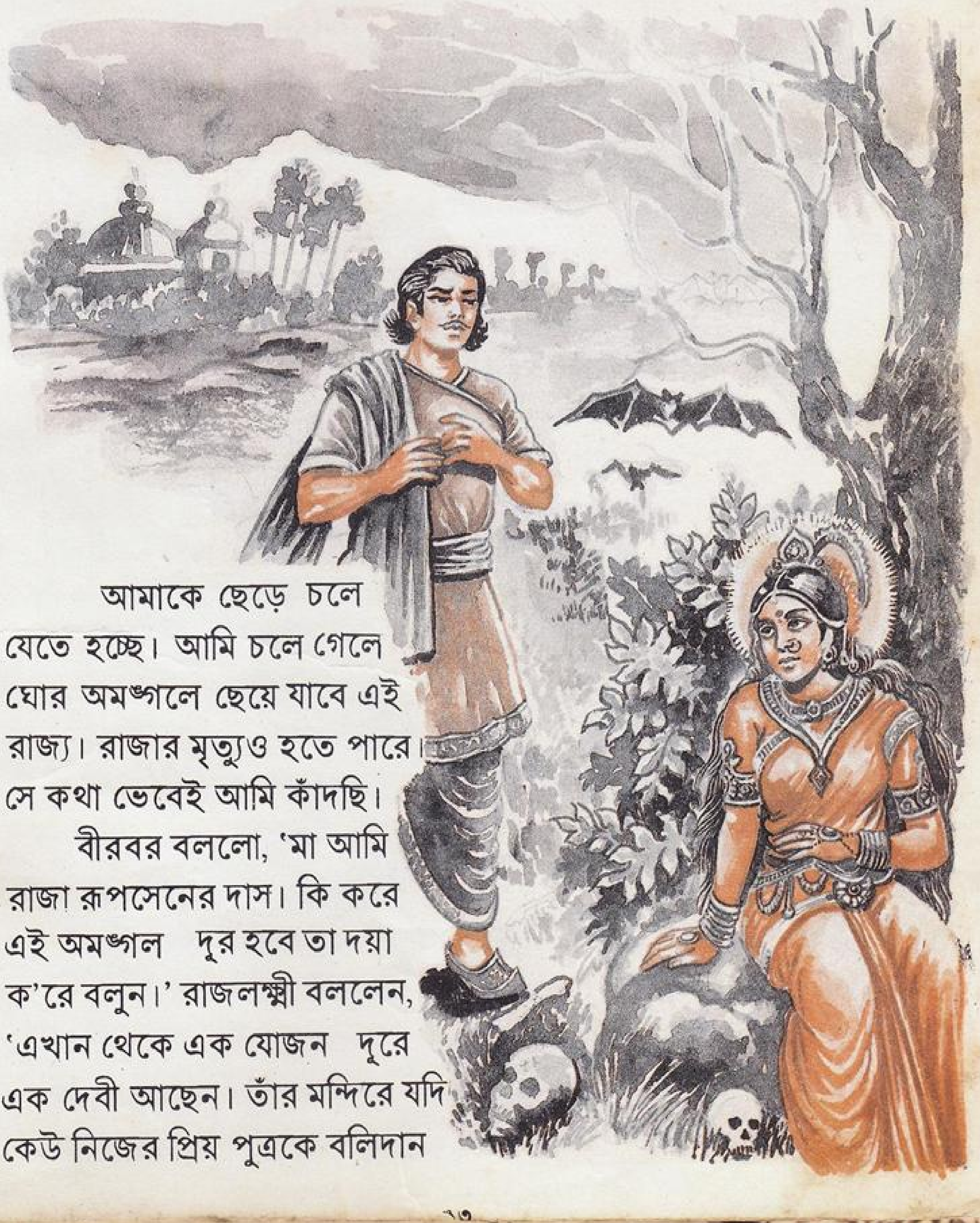

আমাকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আমি চলে গেলে ঘোর অমঙ্গলে ছেয়ে যাবে এই রাজ্য। রাজার মৃত্যুও হতে পারে। সে কথা ভেবেই আমি কাঁদছি।

বীরবর বললো, 'মা আমি রাজা রূপসেনের দাস। কি করে এই অমঙ্গল দূর হবে তা দয়া ক'রে বলুন।' রাজলক্ষ্মী বললেন, 'এখান থেকে এক যোজন দূরে এক দেবী আছেন। তাঁর মন্দিরে যদি কেউ নিজের প্রিয় পুত্রকে বলিদান

দিতে পারে, তবেই রাজ্যের অমঙ্গল দুর হবে।'

বীরবর সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে এসে স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলল। রাজা রূপসেন কিন্তু সেই রাতে সব সময়ই বীরবরের পিছনে গোপনে থেকে তার সব কাজ লক্ষ্য করছিলেন। বীরবরের স্ত্রী এবং পুত্র রাজী হতে তারা সকলে মিলে সেই দেবীর মন্দিরে হাজির হলো।

বীরবর দেবীর পূজা সেরে তাঁরই হাতের খাঁড়া নিয়ে পুত্রকে বলি দিল। ভাইয়ের মৃত্যু দেখে বীরবরের কন্যাও সেই খড়গে নিজের প্রাণ দিল। পুত্র এবং কন্যাকে হারিয়ে বীরবর এবং তার স্ত্রীও দেবীর সামনে নিজেদের বলি দিল। রাজা আড়াল থেকে সব কিছুই দেখছিলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁরই মঙ্গলের জন্য বীরবরের সংসারে আর কেউ বেঁচে থাকলো না। তাঁরও রাজ-সুখ ভোগ ক'রে বাঁচার ইচ্ছা থাকলো না। তিনিও দেবীর খাঁড়ার আঘাতে নিজের দেহকে দ্বিখন্ডিত করতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী রাজাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার ব্যবহারে খুশী হয়েছি। তুমি কি বর চাও?'

রাজা রূপসেন বললেন, 'মা, আপনি বীরবরের সকলকে বাঁচিয়ে তুলুন। আমি আর কিছু চাই না।' দেবী তার প্রার্থনা পূরণ করলেন।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজা বল তো, এদের মধ্যে সব থেকে কে বেশী উদার?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজা রূপসেন। কারণ তিনি রাজ সুখকেও তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে সেবকের জন্য প্রাণ দিতে রাজী হলেন।'

মরণকালে হাসি

চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন এক বনে ঘোড়ায় চড়ে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। অবশেষে একটি হরিণের পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি এক মুনির আশ্রমে এসে হাজির হলেন।

আশ্রমে ছিল এক আশ্রম কন্যা। খুব সুন্দরী। রাজা মুনিকে গিয়ে প্রণাম করতে তিনি বললেন, 'আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।' রাজা বললেন, 'আমি আপনার আশ্রম কন্যাটিকে বিয়ে করতে চাই।' মুনি রাজী হলেন।

রাজা রূপদত্ত আশ্রম কন্যাকে বিয়ে করে ফেরার পথে রাত্রি নেমে এলো। তখন ঘোড়াটিকে পাশে বেঁধে রেখে আশ্রম কন্যা এবং রাজা এক গাছের নীচে শুয়ে পড়লেন। মাঝরাতে রাজার ঘুম ভেঙে যেতে দেখেন, তাঁদের সামনে এক রাক্ষস। রাক্ষস বললো, 'আমি ক্ষুধার্ত। আমি তোমার স্ত্রীকে ভোজন করবো।'

রাজা বললেন, 'না, তুমি তা কোরোনা। আমার স্ত্রীর প্রাণের বিনিময়ে তুমি যা চাইবে, তাই দেবো।' রাক্ষস বললো, তুমি যদি বারো বছর বয়সের

কোন ব্রাহ্মণ পুত্রের মুন্ড কেটে আমার হাতে দিতে পারো, তাহলে আমি তোমার স্ত্রীকে খাবো না। রাজা বললেন, 'বেশ তা-ই হবে তুমি আজ থেকে সাতদিনের দিন আমার রাজধানীতে গেলে তোমার ইচ্ছা পূরণ করবো।'

রাজা আশ্রম কন্যাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে প্রধান মন্ত্রীকে রাক্ষসের কথা বললেন। তিনি বললেন, 'মহারাজ, আপনি চিন্তা করবেন না। অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রধান মন্ত্রী এক মানুষ প্রমাণ চারটি সোনার মূর্তি গড়িয়ে বসিয়ে রাখলেন রাজধানীর চারপাশে। আর প্রচার করলেন, যে ব্রাহ্মণ তার বারোবছর বয়সের বালককে বলিদানের জন্যে রাজার হাতে দেবে, সে ঐ মূর্তিগুলি বালকের প্রাণের দামের বিনিময়ে লাভ করবে। চিত্রকূট নগরে এক খুব গরীব ব্রাহ্মণ ছিল। ঘোষণা শুনে সে তার স্ত্রীকে বললো, দেখ, আমাদের তো বারো বছর বয়সের একটি ছেলে রয়েছে। এসো না, তাকে আমরা রাজার হাতে তুলে দি। তাহলে ওই চারটি সোনার মূর্তি পাই। আর তাহলে আমাদের আর কোন অভাব থাকে না। তুমি যদি মত দাও, তাহলে একটা উপায় হয়।' ব্রাহ্মণী রাজী হলো।

রাজা ব্রাহ্মণপুত্রের বদলে ব্রাহ্মণকে চারটি সোনার মূর্তি দিয়ে দাম মেটালেন।

এরপর যথারীতি সপ্তম দিনে রাক্ষস রাজধানীতে এসে হাজির। মন্ত্রীও ব্রাহ্মণপুত্রের মুন্ড কাটার জন্য একটি খড়গ সমেত ব্রাহ্মণপুত্রকে হাজির করলেন। রাজা তার মুন্ড কাটার জন্য খড়গ তুললে ব্রাহ্মণপুত্র হেসে ফেললো। ব্রাহ্মণ পুত্রের মুন্ড রাক্ষসের হাতে তুলে দিয়ে রাজা দায়মুক্ত হলেন। রাক্ষস ফিরে গেল।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা, প্রাণ যাওয়ার মুহূর্তে সবাই কাঁদে। কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্র হাসলো কেন?' রাজা বললেন, 'যে পিতামাতা পুত্রকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, তারাই বালকটিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন। আবার যে রাজার কাছে বিপদে পড়া মানুষ আশ্রয় নেন, তিনিই তাকে হত্যা করছেন। এই কথা ভেবেই ব্রাহ্মণপুত্র হেসেছিল।'

রাজা ও রাজকুমার

মিথিলা নগরে গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব ভালো রাজা জেনে দক্ষিণদেশের এক রাজকুমার তাঁর অধীনে কাজ করার জন্যে হাজির হলেন। দিন যায়, মাস যায়, রাজকুমার রাজার দর্শন পান না। রাজা দরবারে আসেন না। মন্ত্রীই রাজকার্য চালান। আর রাজা অন্তঃপুরে রাণীদের সঙ্গে গল্প-গুজবে আনন্দে দিন কাটান। এমনি করে পুরো একটি বছর কেটে গেলো। দক্ষিণদেশের রাজকুমার অধৈর্য হয়ে পড়লেন। টাকা-পয়সা সঙ্গে যা এনেছিলেন, তাও ফুরিয়ে গেল। একদিন তিনি ভাবলেন, এমন এক অপদার্থ রাজার অধীনে কাজ করার থেকে বেকার থাকা ভালো। তাছাড়া চাকরি তো দাসের কাজ। তার থেকে বনে গিয়ে ভগবানকে ভজনা করাই উচিত।

দক্ষিণদেশের রাজকুমার দূরে এক বনে চলে গেলেন। সেখানে কুটীর বানিয়ে ভগবানের আশায় দিন কাটাতে থাকলেন। এরপর কেটে গেছে বেশ কিছুদিন। রাজা গুণাধিপ একদিন এক বনে মৃগয়া করতে গেছেন। হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নেমে এলো। রাজা খিদে এবং পিপাসায় কাতর হলেন।

বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে রাজা গুণাধিপ দেখতে পেলেন এক কুটীর। তার মধ্যে বসে আছেন এক তাপস। রাজা তাপসকে হাত জোড় করে

বললেন, 'আমি খিদে আর পিপাসায় কাতর। আমাকে জল আর কিছু খাবার দয়া করে দিন।' তাপস বনের ফলমূল এবং জল রাজাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। তাপসের সেবায় রাজা প্রাণ ফিরে পেলেন।

সকালে রাজা তাপসকে বললেন, 'দয়া করে আপনার পরিচয় দান করলে আমি খুশী হই।' তাপস বললেন, 'আমি দক্ষিণদেশের এক রাজকুমার। কাজের আশায় রাজা গুণাধিপের দরবারে এসেছিলাম। কিন্তু রাজা অপদার্থ। রাজকার্য নিজে চালান না। আমি পুরো এক বছর অপেক্ষা করেও তাঁর দর্শন পাইনি। তাই বিরক্ত হয়ে এই বনবাসীর জীবন বেছে নিয়েছি।'

রাজা গুণাধিপ তাপসের কথা শুনে লজ্জা পেলেও নিজের পরিচয় দিলেন। তারপর দক্ষিণদেশের তাপস রাজকুমারকে রাজধানীতে এনে তাঁকে বেশ বড় কাজে নিয়োগ করলেন।

একবার রাজা গুণাধিপের কাজে রাজকুমারকে বিদেশে যেতে হলো। সেখানে সমুদ্রের ধারে এক দেবালয়ে পূজা সেরে বাইরে আসতে তিনি এক সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পেলেন। রাজকুমারের মনের ইচ্ছা জানতে পেরে সেই সুন্দরী কন্যা বললো, 'তুমি সামনের ওই সরোবরে ডুব দিয়ে এসো। তাহলেই তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।' রাজকুমার সরোবরের জলে ডুব দিতেই দেখেন, তিনি রাজা গুণাধিপের রাজপুরীতে পৌঁছে গেছেন। রাজাকে এই বৃত্তান্ত বলতে তিনি তখনই

রাজকুমারকে নিয়ে সেই সরোবরের তীরে পৌঁছালেন। খানিক পরে সেই সুন্দরী কন্যাকেও দেখা গেল। সে রাজার সামনে এসে বললো, 'রাজা, আমি আপনার আদেশমত কাজ করতে রাজী। আমি আপনার রাণী হতে চাই।'

রাজা বললেন, 'তুমি প্রথমেই শপথ করেছ, তুমি আমার কথামত কাজ করবে। কাজেই তোমাকে তোমার কথা রাখতেই হবে। তুমি আমার রাণী না হয়ে এই রাজকুমারকে বিয়ে করো।' কন্যা রাজী হতে রাজা গুণাধিপ তাকে রাজধানীতে এনে বিপুল ধুমধামের মধ্যে রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজা বলো দেখি, রাজা এবং দক্ষিণদেশের রাজকুমার --- এই দু'জনের মধ্যে কে বেশী উদার?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজকুমার। কারণ রাজাকে মৃগয়ার রাতে খিদে এবং পিপাসা থেকে না বাঁচালে রাজা প্রাণে মারা যেতেন।'

কে দোষী ?

নগরের নাম চূড়াপুর। সেখানে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের নাম দেবস্বামী। ব্রাহ্মণীর নাম লাবণ্যবতী। ব্রাহ্মণ গুণে বৃহস্পতি। রূপে রতিপতি। অর্থে ধনপতি। ব্রাহ্মণীরও রূপের-গুণের তুলনা ছিল না। সুখেই কাটে তাঁদের দিন।

তখন গ্রীষ্মকাল। অত্যন্ত গরমের জন্যে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাঁদের বিরাট বাড়ির ছাদে ঘুমোচ্ছিলেন। রাত তখন গভীর। এক গন্ধর্ব তাঁর হাওয়াই-রথে চড়ে আকাশপথে যাচ্ছিলেন। রথ থেকে তিনি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে ঘুমন্ত ব্রাহ্মণীকে চুপি চুপি তাঁর রথে তুলে নিলেন। ব্রাহ্মণ শুয়ে রইলেন একা।

সকালে ঘুম ভাঙতে পাশে ব্রাহ্মণীকে দেখতে না পেয়ে তিনি অবাক। নাম ধরে ডেকে তিনি লাবণ্যবতীর সাড়া পেলেন না। সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন। না, কোথাও লাবণ্যবতী নেই। তখন ব্রাহ্মণ দেবস্বামী ব্রাহ্মণীর জন্যে কেঁদে আকুল হলেন। সংসার তাঁর ভালো লাগলো না। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তাঁর খুব খিদে পেলো। পথের পাশেই এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে বললেন, 'আমাকে দয়া করে কিছু খেতে দিন। আমি বড় ক্ষুধার্ত।' ব্রাহ্মণ তখনই তাঁকে এক বাটি দুধ এনে দিলেন।

ব্রাহ্মণ দেবস্বামী দুধ খেলেন বটে, তবে তাতে তাঁর শরীর চাঙা না হয়ে বরং দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো। ক্রমশ তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

দেবস্বামী তখন ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আপনি আমাকে বিষ মেশানো দুধ খাওয়ালেন। বুঝতে পারছি, আমি প্রাণে বাঁচবো না।' মুখের কথা শেষ হওয়ার পরই তিনি মরণের কোলে ঢলে পড়লেন।

সত্যসত্যই সেই দুধে বিষ মিশে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণের ঘরে এক কালসাপ ওই দুধে মুখ ডুবিয়েছিল। ফলে দুধে কালসাপের বিষ ঝরে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ তা জানতেন না।

ব্রাহ্মণকে চোখের সামনে মরে যেতে দেখে গৃহস্বামী তাঁর স্ত্রীকে যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। বললেন, 'নিশ্চয়ই তুই আমার অতিথিকে প্রাণে মারবার জন্যে দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিস। তুই আমার সংসার থেকে দূর হয়ে যা।' এই বলে তিনি ব্রাহ্মণীকে তাঁর বাড়ি থেকে বার করে দিলেন।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা, এক্ষেত্রে আসল দোষী কে?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'সাপকে দোষী করা যাবে না। কারণ তার মুখে বিষ থাকবেই। ব্রাহ্মণীকেও দায়ী করা যায় না। কারণ দুধে যে বিষ মিশেছে, তা তিনি জানতেন না। ব্রাহ্মণ দেবস্বামীকেও দোষী করা যায় না। কারণ তাঁর পক্ষে অত খোঁজখবর রাখা সম্ভব ছিল না। দোষী গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ। কারণ তিনি বিনা দোষে তাঁর ব্রাহ্মণীকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিলেন।

তিন রাণীর গল্প

গৌড়দেশের বর্ধমান নগরে গুণশেখর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রধান অমাত্যের নাম ছিল অভয়চন্দ্র। তিনি মূর্তিপূজা মানতেন না। অবশেষে তিনি রাজাকে বোঝালেন, 'মহারাজ, কোন রকম পূজা-আর্চা করার প্রয়োজন বুঝি না। ওসব অনর্থক।'

রাজা অমাত্য অভয়চন্দ্রের কথা মেনে নিলেন। তারপর তাঁর রাজ্যে প্রচার করলেন, কেউ কোন দেবতার পূজা-আর্চা যেন না করে। যারা রাজার আদেশ অমান্য করবে, তাদের রাজা প্রাণদন্ড দেবেন। প্রজারা ভয়ে ভয়ে রাজার আদেশ মেনে নিলেও লুকিয়ে লুকিয়ে দেব-দেবীর পূজা করতে লাগলো।

একদিন অমাত্য অভয়চন্দ্র রাজা গুণশেখরকে নানা উপদেশ দিলেন।

---মহারাজ, শুনুন, কেউ এজন্মে কারও প্রাণ নিলে পর জন্মে তারও প্রাণ নেয় ওই নিহত ব্যক্তি। বিশাল জন্তু হাতী থেকে শুরু করে একেবারে ছোট যে কীট --- তাদের সবাইকে রক্ষা করাই মানুষের কর্তব্য। যে মানুষ অন্য প্রাণীর মাংস খেয়ে নিজের শরীরের মাংস বাড়ায়, তার থেকে অধম আর কেউ নেই। সেই সব মানুষেরা মরণের পরে নরকে গমন করে। তাদের বারে বারে এই পৃথিবীতে কখনো কানা, কখনো খোঁড়া, কখনো বোবা আবার কখনো কালা হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

অবশেষে রাজা গুণশেখরের মৃত্যু হ'লে তার ছেলে ধর্মধ্বজ বর্ধমানের রাজা হলেন। তিনি তাঁর পিতার আদেশ অনুযায়ী চললেন না। তিনি আবার নানা দেব-দেবীর পূজা চালু করলেন। প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্রের মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাজপথে ঘোরালেন। কারণ তাঁরই পরামর্শে তাঁর পিতা পূজা-আর্চা বন্ধ করেছিলেন।

অবশেষে ঋতুরাজ বসন্ত এলো রাজা ধর্মধ্বজের রাজ্যে। রাজা রাণীদের নিয়ে এক উপবনে বেড়াতে গেলেন। উপবনে ছিল একটি সরোবর। সরোবরের কাক-চক্ষু জলে অজস্র পদ্মফুল ফুটেছিল। রাজা ধর্মধ্বজ নিজে কয়েকটি পদ্মফুল তুলে এনে এক রাণীর হাতে দিলেন। দৈবাৎ একটি পদ্ম রাণীর হাত থেকে ফসকে গিয়ে তাঁর বাঁ পায়ের উপর পড়লো। ফলে তাঁর বাঁ পা ভেঙে গেল। রাজা হায় হায় করে উঠলেন।

অবশেষে সন্ধ্যা নেমে আসার পরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠলো। চাঁদের রূপালী আলোয় রাজার দ্বিতীয় রাণীর গায়ের চামড়া পুড়ে গেল। রাজা হায় হায় করে উঠলেন।

কিছু পরে উপবনের পাশে এক পল্লী থেকে ধান ভানার শব্দ আসতে থাকলো। সেই শব্দে রাজার তৃতীয় রাণীর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। ফলে তিনি মূর্ছা গেলেন।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজা, বলো, এই তিন রাণীর মধ্যে কে সব থেকে কম কষ্ট সহ্য করতে পারেন?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যে রাণীর গায়ের চামড়া চাঁদের আলোয় পুড়ে গিয়েছিল, তিনি।'

গুণকরের সাধনা

হেমকূট নামে এক নগর। সেখানে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র, নাম গুণকর। কিন্তু তার কোন গুণই ছিল না। সে পাশা খেলায় তার বাবার টাকাকড়ি নষ্ট করতো। এমন কি চুরি করতেও তার বাধতো না। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা তাঁর এই অপদার্থ পুত্রটিকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

গুণকর ঘুরতে ঘুরতে এক শ্মশানে এসে দেখে, এক যোগী ধ্যান করছেন। যোগীর ধ্যান ভাঙতে তিনি গুণকরকে দেখে বুঝতে পারলেন, সে

ক্ষুধার্ত। যোগী তাকে একটা মড়ার মাথার খুলিতে কিছু খাবার দিয়ে বললেন, 'তুমি ক্ষুধার্ত। এগুলি ভোজন করো।' গুণকর বললো, 'মড়ার মাথার খুলিতে কিছু খেতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।'

গুণকরের সাধনা

তখন যোগী আর একবার চোখ বুজতেই তাঁর সামনে এক সুন্দরী রমণী এসে হাজির হলো। সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের পাশেই এক অট্টালিকাও দেখা গেল। যোগী রমণীকে বললেন, 'তুমি একে নিয়ে গিয়ে এর সেবার আয়োজন কর।' গুণকরকে রমণী অট্টালিকায় নিয়ে গিয়ে সোনার থালায় নানা রকমের সুস্বাদু খাবার খাওয়ালো। রাত্রে গুণকরের শোবার ব্যবস্থা হলো নরম বিছানার পালঙ্কে। এমনকি সেই সুন্দরী রমণী তার পদসেবাও করলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে গুণকর অবাক। কোথায় বা সেই অট্টালিকা। আর কোথায় বা সেই সুন্দরী রমণী। সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। যোগী বললেন, 'এসবই যোগ সাধনায় সম্ভব হয়েছে।' গুণকর বললো, 'প্রভু, আপনি আমাকে সেই সাধনা শেখান।' তখন যোগী বললেন, 'তাহলে তোমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দি। তুমি সেই মন্ত্র চল্লিশ রাত্রি জলে গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে জপ করো।' চল্লিশ রাত শেষ হতে গুণকর যোগীর কাছে গেল। যোগী বললেন, 'এবার তুমি চল্লিশ দিন জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে থেকে ওই মন্ত্র জপ করো।' গুণকর বললো, 'প্রভু, আমার বাবা-মার জন্যে মন আকুল হচ্ছে। আমি একবার বাড়ি ফিরে যাই। তাঁদের দেখে এসে আপনার কথা মত জ্বলন্ত আগুনে মন্ত্র জপ করবো।'

গুণকর বাড়ি ফিরতে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা আর তাঁর স্ত্রী খুব আনন্দ পেলেন। গুণকর সংসার ছেড়ে আবার চলে যাবে শুনে তাঁরা বললেন, 'না বাবা, তোমাকে আর যেতে হবে না। এ সংসার তোমার। তুমি বিয়ে-থা করে সংসারী হও।' গুণকর বললো, 'না, আমি সংসারে থাকবো না। কারণ আমি জেনেছি, এ সংসারে কেউ কারও নয়। কে কার পিতা? কে কার মাতা? কে-ই বা কার সন্তান? কেউ কারও নয়। আমরা অনর্থক মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ি। আমি চললাম।' গুণকর যোগীর কাছে ফিরে এলো। জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে সাধনা করতে শুরু করলো। কিন্তু সফল হলো না।

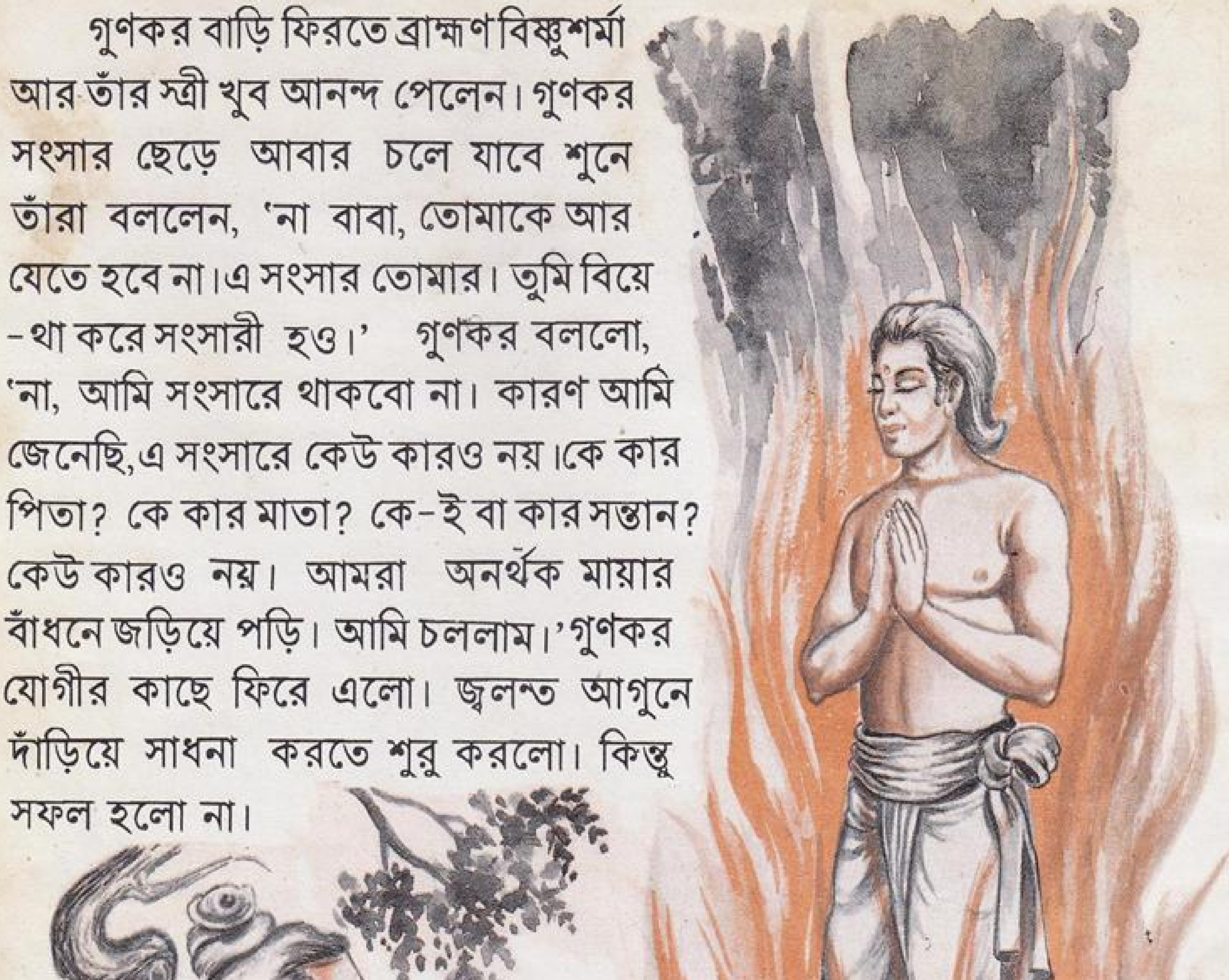

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা, বলো তো, গুণকর এত কষ্টের সাধনায় সফল হলো না কেন?' বিক্রমাদিত্য বললো, 'গুণকর যতই তার বাবা-মাকে বলুক, এ সংসার কেবল মাত্র মায়ার বাঁধন, সে নিজে সে বাঁধন থেকে মুক্তি আসলে পায় নি। তাই সে তার সাধনার অর্ধেক বাকি রেখে তার বাবা-মার কাছে ছুটে এসেছিল তাঁদের দেখতে।'

অপদার্থ রাজা

পুণ্যপুর নগরের রাজাকে নিয়ে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের ভারী ঝামেলা। রাজা রাজার কাজ করেন না। দিন-রাত আনন্দ-ফূর্তিতে মেতে থাকেন। রাজত্বের রাশি রাশি ঝামেলা মন্ত্রীর ঘাড়ে। তিনি অন্য কিছু ভাববার সামান্য অবসরও পান না। ফলে তাঁর শরীর মন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকলো। তাই তিনি রাজার কাছে কিছুদিনের জন্যে অবসরের অনুমতি নিয়ে বিদেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। যাতে ভেঙে পড়া শরীর মন গড়ে ওঠে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি হাজির হলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। সেখানে একদিন তিনি মহাদেবের পুজো সেরে মন্দিরের বাইরে এসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হঠাৎ দেখলেন, সমুদ্রের জল থেকে একটি সোনার গাছ দেখা দিলো। আর সেই গাছের শাখায় এক সুন্দরী নারী। সে বীণা বাজিয়ে সুন্দর গান গাইছে। পরক্ষণেই মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ দেখলেন, সুন্দরী নারী সমেত সেই গাছটি সমুদ্রের জলের তলায় মিলিয়ে গেল।

মন্ত্রী দেশে ফিরলেন। একদিন পুণ্যপুরের রাজাকে কথায় কথায় সেতুবন্ধ রামেশ্বরের সমুদ্রে সেই সুন্দরী নারীর ঘটনাটি শোনালেন। রাজা পরের দিনই মন্ত্রীর উপর রাজ-কাজের ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়ে হাজির হলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। মহাদেবের পূজার শেষে রাজাও সমুদ্রের জলে সেই সুন্দরী নারীকে দেখতে পেলেন। রাজা এক লাফে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চড়ে বসলেন সোনার গাছটিতে। যার উপর সুন্দরী নারীটিও বসে ছিল। রাজা সমুদ্রের নীচে পাতালপুরীতে পৌঁছে গেলেন।

সুন্দরী নারীটি রাজাকে বললো, 'রাজা, আপনার সাহস দেখে আমি খুশী। আমি আপনার রাণী হতে রাজী। তবে এখানে আপনি অন্ধকার পক্ষে চতুর্দশী তিথিতে আমার ঘরে থাকবেন না। বিপদ হতে পারে।'

অবশেষে অন্ধকার পক্ষের চতুর্দশী তিথি এলো। রাজা আড়ালে লুকিয়ে থাকলেন। আর নজর রাখতে থাকলেন সুন্দরী নারীটির ঘরের দিকে। গভীর রাতে দেখলেন, এক রাক্ষস সেই ঘরে ঢুকলো। রাজা থাকতে পারলেন না। পিছন দিক থেকে গিয়ে তিনি তাঁর তরবারির এক কোপে রাক্ষসকে কেটে ফেললেন।

তখন সেই সুন্দরী যারপরনাই খুশী হয়ে বললো, 'এতদিনে আমার শাপমুক্তি হলো। আমার পিতার অভিশাপে আমার এই পাতাল বাস। এই রাক্ষস বিশেষ বিশেষ তিথিতে এসে আমার উপর জুলুম চালাতো।'

রাজা সেই সুন্দরী নারীকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের ঝামেলা কমলো না। রাজা আবার আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতে থাকলেন। প্রজাদের ভাবনা ছেড়ে দিলেন। মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের মৃত্যু হলো।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা, বলো দেখি, মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের মৃত্যুর কারণ কি? বিক্রমাদিত্য বললেন, 'অপদার্থ রাজার মন্ত্রীকে কেউ সম্মান করে না। এই দুঃখে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।

জীমূতবাহনের কথা

হিমালয়ের কোলে সুন্দর এক নগর। নাম পুষ্পপুর। সেখানকার রাজার নাম জীমূতকেতু। কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা করে তিনি এক পুত্র লাভ করলেন। রাজা জীমূতকেতু পুত্রের নাম রাখলেন জীমূতবাহন। রূপে-গুণে তুলনা মেলে না জীমূতবাহনের। রাজা জীমূতকেতু এবার কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন, 'আমার প্রজাদের দুঃখ দূর করে ধনবান করো।' কল্পতরু সে প্রার্থনা পূরণ করলো। কিন্তু তার ফল হলো বিপরীত। প্রজারা ধনবান হওয়ায় রাজাকে আর পরোয়া করলো না। বরং ষড়যন্ত্র করে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

জীমূতবাহন তাঁর পিতা, রাজা জীমূতকেতুকে ব্যাপারটা জানাতে তিনি বললেন, 'রাজা-রাজধানী-রাজকোষ ক'দিনের জন্যে? চলো, আমরা বরং রাজ্য ত্যাগ করে চলে গিয়ে তপস্যা করি।'

জীমূতবাহন অবশেষে তাঁর পিতা জীমূতকেতুর সঙ্গে এসে হাজির হলেন মলয় পর্বতে। সেখানে দেবী কাত্যায়ণীর মন্দির। এক ঋষিকুমার জীমূতবাহনের বন্ধু হলেন। বন্ধুর সঙ্গে একদিন কাত্যায়ণীর মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, এক সুন্দরী রাজকন্যা দেবী কাত্যায়ণীর মন্দিরে গান গেয়ে দেবীর পুজা করছে। রাজকন্যাও রাজপুত্র জীমূতবাহনকে দেখে খুশী হলেন। রাজ-কন্যার নাম মলয়বতী।

অবশেষে মলয়বতীর সঙ্গে জীমূতবাহনের বিবাহ হতেও দেরী হলো না। মলয়বতীর পিতা মলয়কেতুও জীমূতবাহনকে জামাতা হিসাবে পেয়ে খুশী হলেন।

একদিন জীমূতবাহন মলয় পাহাড়ের এক জায়গায় এক কংকালের পাহাড় দেখতে পেলেন। আর দেখলেন, এক নাগিনী সেখানে বসে কাঁদছে। সেদিন নাগিনীর একমাত্র পুত্র শঙ্খচূড় পক্ষিরাজ গরুড়ের আহার হয়ে এসেছে। তখন জীমূতবাহনের বুঝতে বাকি থাকলো না যে, ওই কংকালের

পাহাড় গরুড়ের খাওয়া নাগেদের কংকাল থেকেই তৈরী হয়েছে। জীমূতবাহন নাগিনী এবং নাগিনীর পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে গরুড়েরখাদ্য হলেন।

গরুড় জীমূতবাহনকে খেতে আরম্ভ করলে নাগিনীর পুত্র শঙ্খচূড় আবার এসে হাজির হলো। তারপর গরুড়কে বললো, 'আপনি যাঁকে ভোজন করছেন, আমি তাঁর পরিচয় জেনেছি। তিনি রাজপুত্র জীমূতবাহন। তিনি নিজের প্রাণ দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করছেন। আপনি আমাকে আহার করুন।'

গরুড় এ কথা শুনে জীমূতবাহনের উপর খুশী হয়ে বললেন, 'আমি তোমার উদারতায় অবাক হয়েছি। তুমি কি বর চাও?জীমূতবাহন বললেন, 'আপনি অনুগ্রহ করে নাগদের ধ্বংস করা বন্ধ করুন।' গরুড় বললেন, 'বেশ, তাই হবে। তোমার মঙ্গল হোক।'

গরুড়ের আশীর্বাদে জীমূতবাহন আবার তাঁদের হারানো রাজ্যের রাজা হলেন। সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের জীবন সঁপে দিলেন। জীমূতকেতুর জীবনে আবার সুখ-শান্তি ফিরে এলো।

বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা, জীমূতবাহন আর শঙ্খচূড় -- এদের দু'জনের মধ্যে তোমার কাছে কে আদর্শবান বলে মনে হয়? বিক্রমাদিত্য বললেন, 'শঙ্খচূড়। কারণ প্রাণ ফিরে পেয়েও গরুড়ের কাছে আবার সে প্রাণ দিতে এগিয়ে গেল। জীমূতবাহন জাতিতে ক্ষত্রিয়। অপরের জন্য প্রাণ দেওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তাঁর প্রাণদানকে আমি বিরাট কোন কাজ বলে মনে করি না।'

যোগ্য কে ?

রাজ্যের নাম চম্পানগর। রাজার নাম চন্দ্রপীড়। আর রাজকন্যার নাম ত্রিভুবন সুন্দরী। রূপে গুণে তার তুলনা নেই। রাজা চন্দ্রপীড় রাজকুমারীর বিয়ে দেবেন। এ খবর শুনে নানা দেশের রাজকুমাররা নিজের নিজের ছবি আঁকালেন। তারপর সেসব ঝলমলে ছবি এসে পৌছাতে লাগলো রাজার কাছে। রাজা সেগুলি পাঠিয়ে দেন রাজকুমারীর কাছে। কিন্তু রাজকুমারী কোন ছবিই পছন্দ করলো না।

রাজা তখন ঠিক করলেন, তাঁর রাজসভায় ভিন দেশের বিভিন্ন রাজকুমারদের আহ্বান জানাবেন। ত্রিভুবন সুন্দরী তাদের মধ্যে থেকে বেছে নিক তার যোগ্য পাত্র। রাজকন্যা বললো, 'বাবা, ওসবের দরকার নেই। যে বিদ্যা-বুদ্ধি আর শক্তি --- এই তিন গুণে বড়, আমি তাকেই বিয়ে করবো।'

এ খবর শুনে ভিন দেশ থেকে চার বর এসে হাজির হলো। রাজা চন্দ্রপীড়

তাদের নিজের নিজের গুণের পরিচয় দিতে বললেন।

প্রথম জন বললো, 'মহারাজ, আমি ছোটবেলা থেকে বহু পরিশ্রমে নানা বিদ্যায় নিপুণ। আমি প্রতিদিন একখানি করে কাপড় বুনি, যা বিক্রী হয় পাঁচটি রত্নের বিনিময়ে। তা থেকে একটি রত্ন আমি ব্রাহ্মণকে দান করি। দ্বিতীয় রত্নটি দেবসেবায় লাগাই। তৃতীয় রত্নটি আমার শরীরে ধারণ করি। চতুর্থ রত্নটি আমার যে স্ত্রী হবে, তার জন্যে রেখে দি। আর পঞ্চম রত্নটি খরচ করি আমার প্রতিদিনের নানা প্রয়োজনে। আর আমার রূপ যে কেমন, তা তো আপনি নিজের চোখে দেখতেই পাচ্ছেন।'

দ্বিতীয় জন বললো, 'মহারাজ, আমি জলে এবং ডাঙায় যত রকমের পশুপাখি আছে, তাদের ভাষা বুঝতে পারি। আমার সমান বলবান পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আর আমার রূপ তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।'

তৃতীয় জন বললো, 'মহারাজ, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অসাধারণ। আর রূপের কথা নিজে আর কি বলবো। আপনি নিজের চোখে দেখে নিন।'

চতুর্থ জন বললো, 'মহারাজ, শাস্ত্রে, আমারও যথেষ্ট জ্ঞান। আমি দূরের শব্দ শুনে বাণ ছুঁড়ে দিয়ে পশু পাখি শিকার করতে পারি। আমার রূপ যে কেমন, তা' আপনি নিজের চোখে দেখে নিন।'

রাজা চন্দ্রপীড় চার ভিন দেশীর নানা গুণের কথা শুনে চার জনকেই যোগ্য বলে মনে করলেন। কিন্তু তাঁর মনে করায় কি আসে যায়! তিনি রাজ কুমারীকে সব কথা জানালেন। ত্রিভুবন সুন্দরী সব কথা শোনার পর মাথা নীচু করে রইলো। ভাবতে থাকলো, কে সব থেকে যোগ্য?

বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে বললো, 'রাজা, তুমি বলো, বর হিসাবে রাজকুমারীর কা'কে বরণ করে নেওয়া উচিত?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যে কাপড় বুনে বিক্রী করে, সে শুদ্র। যে পশু পাখীর ভাষা বোঝে, সে জাতিতে বৈশ্য, যে সমস্ত শাস্ত্র জানে, সে ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে শব্দ শুনে বাণ ছুঁড়তে পারে, একমাত্র সে-ই রাজকুমারীর স্বজাতীয়। কাজেই চতুর্থ জনই রাজকুমারীর যোগ্য পাত্র।'

ধারানগরের মেয়ে মহাদেবী

ধারানগরে মহাবল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দূতের নাম হরিদাস।হরিদাসের সুন্দরী কন্যাটির নাম মহাদেবী। তার বিয়ের বয়েস হয়েছে। হরিদাস তার জন্যে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিলেন। একদিন মহাদেবী তার বাবাকে বললো, 'সব রকমের গুণে গুণী পাত্র ছাড়া আমি অন্য কাকেও বিয়ে করবো না।'

রাজা মহাবল একদিন বললেন, 'হরিদাস, দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা আমার বন্ধু। তুমি তার খবর নিয়ে এসো। অনেক দিন তার কোন খবর পাইনি।' রাজার আদেশে দূত হরিদাসকে দক্ষিণ দেশে যেতে হলো। রাজা সাদরে বন্ধু রাজার দূত হরিদাসকে আহ্বান জানালেন।

একদিন হরিদাসের ঘরে দক্ষিণ দেশেরই এক ব্রাহ্মণপুত্র এসে তাঁকে বললো, 'আমি শুনেছি, আপনার এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। আমি সব বিদ্যায় গুণী। সব থেকে বড় কথা, আমি এমন একটা রথ বানিয়েছি, যা অল্প সময়ে এক বছরের দূরত্বে পৌঁছাতে পারে।'

হরিদাস বললেন, 'বেশ, আমি রাজী। আমি কাল দেশে ফিরবো। তুমি তোমার রথ নিয়ে আগামী কাল সকালে এখানে এসো।' পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ পুত্রের রথে চড়ে খুব কম সময়েই হরিদাস ধারানগরে ফিরলেন এবং ব্রাহ্মণ পুত্রটি যে কন্যা মহাদেবীর যোগ্য পাত্র, তা তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রকে জানালেন। এদিকে হয়েছে কি, হরিদাসের স্ত্রী এবং পুত্রও মহাদেবীর জন্যে আরও দুই পাত্রকে মহাদেবীর সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা দিয়ে বসে আছেন। তারা দু'জনেও কম গুণী নয়।

এখন সমস্যা দেখা দিল, কার সঙ্গে মহাদেবীর বিয়ে দেওয়া যায়। হঠাৎ দেখা গেল, পরের দিন সকালে মহাদেবীকে তার শোবার ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিক খুঁজেও তার কোন সন্ধান মিললো না। তিন পাত্রও সে খবরে বড় দুঃখ পেল।

তখন প্রথমপাত্র বললো, 'থামুন, আমি বহু দূরের জিনিসও দেখতে পাই।' এই কথা বলে সে কিছুক্ষণ পরে বললো, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, মহাদেবীকে বিন্ধ্য পর্বতে এক রাক্ষস ধরে নিয়ে গেছে।' দ্বিতীয় পাত্র বললো, 'আমি শব্দভেদী বাণ ছুঁড়তে পারি। আমাকে বিন্ধ্য পর্বতে নিয়ে গেলে রাক্ষসের গর্জনের শব্দ শুনে তাকে মেরে ফেলতে পারবো।'

তৃতীয় পাত্র বললো, 'আমার রথ চোখের পলক ফেলতে তা ফেলতে বিন্ধ্য পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে যেতে পারে।' ব্যস, তখনই তিন পাত্র রথে চড়ে বেরিয়ে পড়লো মহাদেবীকে রাক্ষসের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে।

কিছুক্ষণ পরেই তারা মহাদেবীকে নিয়ে ফিরে এলো। হরিদাস, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র --- হারানো মহাদেবীকে ফিরে পেয়ে মহা খুশী। কিন্তু সমস্যা বাধলো পাত্র বাছাই নিয়ে। তিন পাত্র প্রত্যেকেই বলতে থাকে, 'আমিই সব থেকে যোগ্য পাত্র। মহাদেবীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিন।' বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজা, বলো, এই তিনজনের মধ্যে কে মহাদেবীর স্বামী হতে পারে?' বিক্রমাদিত্য বললেন, তিন পাত্রই যথেষ্ট গুণী। তবে রাক্ষসকে প্রাণে না মারতে পারলে মহাদেবীকে ফিরে পাওয়া যেতো না। কাজেই যে পাত্র শব্দভেদী বাণে রাক্ষসকে প্রাণে মারলো, আমার মতে সেই যোগ্য পাত্র।'

দেহ বদলের হাসি-কান্না

চম্পা নগরে নারায়ণ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বয়েসের ভারে শরীর, মন সবই দুর্বল। মানুষ বেঁচে থাকলেই তার বয়েস বাড়বে --- এতো স্বাভাবিক। কিন্তু এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নারায়ণের মোটেই পছন্দসই নয়।

তিনি এক অদ্ভুত বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেই পুরানো, বুড়ো দেহটা ছেড়ে কোন জোয়ানের মৃতদেহে ঢুকে যেতে পারতেন।

নারায়ণ ভেবে দেখলেন, এইবার সেই বিদ্যা কাজে লাগানো যায়। বুড়ো শরীরটা ছেড়ে কোন যুবকের দেহ পেলে আবার মজায়, আনন্দে দুনিয়ায় আরও বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু তা আপন জনদের ভিড়ে থেকে করতে গেলে খুব অসুবিধা। তাই তিনি সংসারের লোকদের শুনিয়ে একদিন বললেন, 'দ্যাখ, আমার বয়েস হয়েছে। বহুদিন সংসারে নানা কিছু ভোগ করলাম। আর তা ভালো লাগে না। এই জীবন আজ আছে, কাল নেই। কাজেই এখন আমার পরকালের চিন্তা করা দরকার। আমি তাই ঠিক করেছি, সংসার ছেড়ে বনে যাবো। সেখানেই জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেবো।'

বাড়ির লোক বৃদ্ধ নারায়ণের এই কপটতা ধরতে পারলো না। তারা কেঁদে আকুল হলো।

নারায়ণ দূরে এক বনে চলে এলেন। সেখানে একটি কুটীর বানিয়ে তাতে থেকে মতলব আঁটতে থাকেন, কেমন করে, কোন সুযোগে একটি যুবকের মৃতদেহের মধ্যে ঢুকে পড়া যায়।

বনের ধারে শ্মশান। যে কোন গ্রাম থেকে শ্মশানে মরা এলে হাজির করলেই নারায়ণ সেখানে যান। দেখেন, মরাটি কোন যুবকের দেহ কিনা। না, কিছুতেই তাঁর আশা পূরণ হয় না। অধিকাংশ মৃতদেহ বুড়ো-বুড়ী কিংবা শিশুর।

অবশেষে একদিন শ্মশানে দারুণ কান্নার শব্দ শুনে নারায়ণ হাজির হলেন। দেখলেন, শ্মশানে এক যুবকের মৃতদেহ আনা হয়েছে। তার আত্মীয় স্বজনেরা শ্মশানে এসে বুক চাপড়ে কাঁদছে। নারায়ণ দেখলেন, এই সুযোগ। এ সুযোগ হাত ছাড়া হতে দিলে চলবে না।

অমনি তিনি মন্ত্রবলে নিজের পুরাণো শরীরটা ছেড়ে যুবকের মৃতদেহে

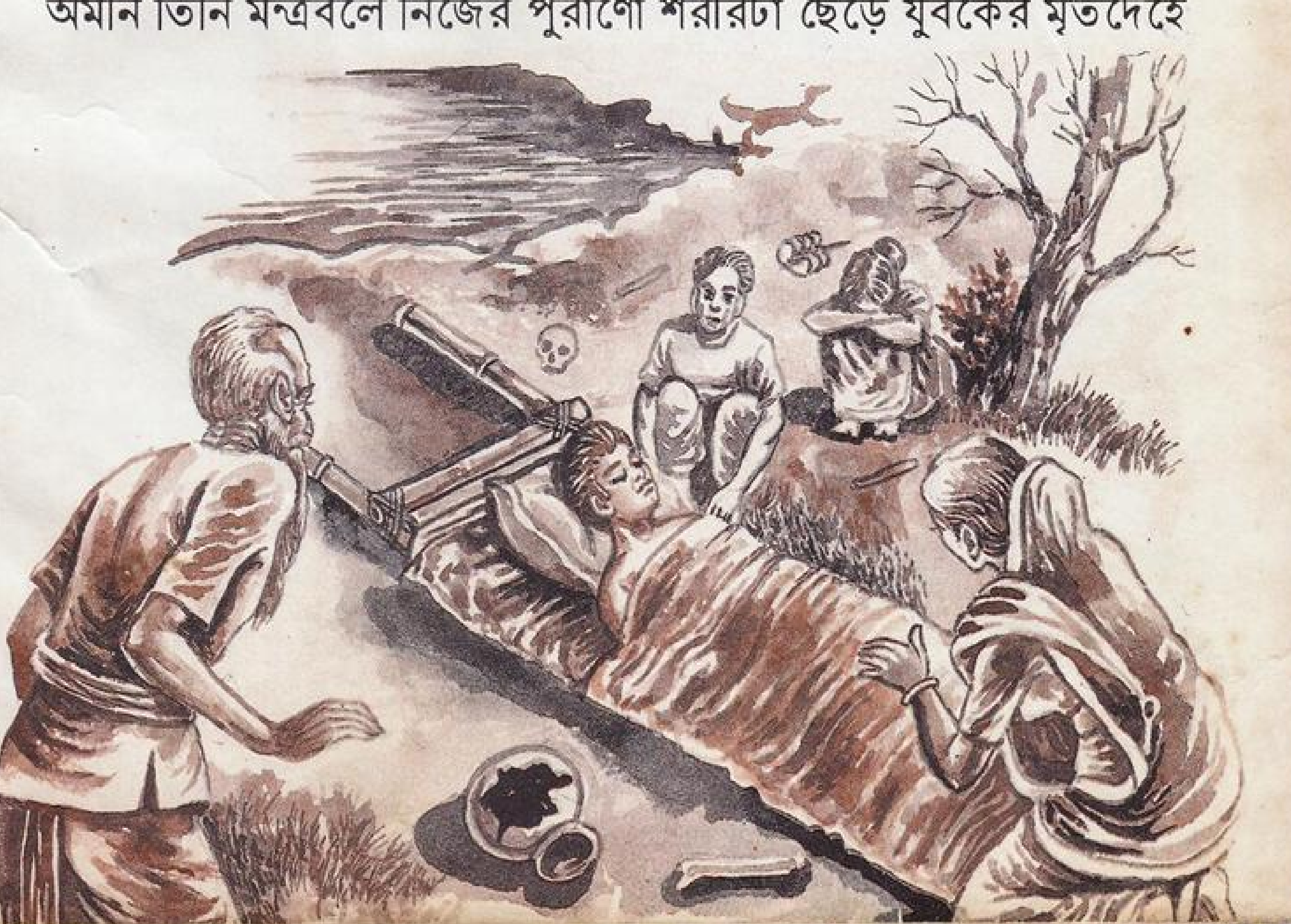

প্রবেশ করলেন। কিন্তু পুরাণো শরীরটা ছাড়ার আগে একবার কাঁদলেন। আবার তার পরেই হেসে উঠলেন। ওদিকে যুবকের দেহ নড়া-চড়া করতে মৃত যুবকের আপনজনেরা খুব খুশী। তারা খুব আনন্দ করতে করতে যুবককে বাড়ি নিয়ে চলে গেল।

বেতাল বিক্রমাদিত্যের কাছে জানতে চাইলো, বৃদ্ধ নারায়ণ পুরাণো দেহটা ছাড়ার সময় একবার কাঁদলো এবং একবার হাসলো কেন? বিক্রমাদিত্য বললেন, 'নারায়ণ জানেন যে, নতুন দেহ নিয়ে তাঁর আপন জনেদের কাছে গেলে তারা চিনতে পারবে না। তাই তিনি কাঁদলেন। আর হাসলেন, যুবকের দেহ নিয়ে আবার ভোগ-সুখের আনন্দে।'